হাজার চুরাশির মা

মহাশ্বেতা দেবী

হাজার চুরাশির মা
মহাশ্বেতা দেবী

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২৩

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ২০০ টাকা

Hajar Churashir Maa by Mahasweta Devi Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-E-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 Kobi Prokashani First Edition: October 2023
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 200 Taka RS: 200 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-97729-8-9

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

অবলোকিতেশের স্মৃতিতে—

সকাল

স্বপ্নে সুজাতা বাইশ বছর আগেকার এক সকালে ফিরে গিয়েছিলেন, প্রায়ই যান। নিজের ব্যাগে গুছিয়ে রাখেন তোয়ালে, জামা, শাড়ি, টুথব্রাশ, সাবান। সুজাতার বয়স এখন তিপ্পান্ন। স্বপ্নে তিনি দেখেন একত্রিশ বছরের সুজাতাকে, ব্যাগ গোছানোয় ব্যস্ত। গর্ভের ভারে মন্থর শরীর, তখনো যুবতী এক সুজাতা ব্রতীকে পৃথিবীতে আনবেন বলে একটি একটি করে জিনিস ব্যাগে তোলেন। সেই সুজাতার মুখ বার বার যন্ত্রণায় কুঁচকে যায়, দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে কান্না সামলে নেন সুজাতা, স্বপ্নের সুজাতা, ব্রতী আসছে।

সেদিন রাত আটটা থেকেই যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল, হেম অভিজ্ঞের মত বলেছিল, পেট নাবুতে নেমেছে মা। আর দেরি নেই। হেমই ওঁর হাত ধরে বলেছিল, ভাল ভালতে দুজনেই দু'ঠাঁই হয়ে ফিরে এস।

যন্ত্রণা হচ্ছিল, ভয়ানক যন্ত্রণা। যে কোন সময়ে সন্তান হতে পারে বলে সুজাতা আগের দিন থেকেই নার্সিংহোমে। জ্যোতির বয়স তখন দশ, নীপার আট, তুলির ছয়। শাশুড়ি সুজাতার কাছেই ছিলেন, মনে আছে। জ্যোতির বাবা শাশুড়ির একমাত্র সন্তান। একটি সন্তান হতেই শাশুড়ি বিধবা। সুজাতার সন্তান হওয়া দেখতে পারতেন না তিনি, ভয়ংকর বিদ্বেষের চোখে তাকাতেন। ঠিক সন্তান হবার সম-সমকালে চলে যেতে বোনের বাড়ি, সুজাতাকে অকূলে ভাসিয়ে।

স্বামী বলতেন মা অত্যন্ত নরম, বুঝলে? তিনি এসব দেখতে পারেন না, যন্ত্রণা-টন্ত্রণা—চেঁচামেচি।

অথব সুজাতা চেঁচাতেন না, কাতরাতেন না কখনো। দাঁতে ঠোঁট চেপে ধরে ছেলেমেয়েদের বিলিব্যবস্থা করতেন। সেবার শাশুড়ি এখানে ছিলেন, কেননা বোন কলকাতায় ছিলেন না। জ্যোতিদের বাবা কানপুর গিয়েছিলেন কাজে, মনে আছে। দিব্যনাথ জানতেনও না মা থেকে যাবেন এবার। থাকেন না, এবার থাকবেন না এই জানতেন। তবু সুজাতার জন্য ব্যবস্থা করে যান নি দিব্যনাথ। কোনদিনই করেন নি। সুজাতা বাথরুমে গিয়ে যন্ত্রণায় কেঁপে ওঠেন। ভয় পেয়ে যান রক্ত দেখে। নিজেই সব গুছিয়ে নেন, ঠাকুরকে বলেন ট্যাক্সি আনতে।

নার্সিংহোমে চলে যান একা একা। ডাক্তার খুব গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। ভয় পেয়েছিলেন খুব। সুজাতার চোখ যন্ত্রণায় ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল, যেন চোখের ওপর

কাচ ঢেকে দিচ্ছিল কে, অস্বচ্ছ কাচ। জোর করে চোখ খুলে ডাক্তারের দিকে চেয়ে সুজাতা বলেছিলেন, অ্যাম আই অলরাইট?

নিশ্চয়।

চাইল্ড?

আপনি ঘুমোন।

কি করবেন?

অপারেশন।

ডাক্তারবাবু, চাইল্ড?

আপনি ঘুমোন। আমি ত আছি। একা এলেন কেন?

উনি নেই।

সুজাতা অবাক হয়েছিলেন। তিনি ত' আশাই করেন নি, কলকাতায় থাকলেও দিব্যনাথ সঙ্গে আসবেন, ডাক্তার কেন আশা করেন। দিব্যনাত সঙ্গে আসেন না, সুজাতাকে নিয়ে যান না সময় হলে। নবজাতকের কান্না শুনতে হবে বলে তেতলায় ঘুমোন। সন্তানদের অসুখ হলেও রাতে খোঁজ নেন না। তবে দিব্যনাথ লক্ষ্য করেন, সুজাতাকে লক্ষ্য করে দেখেন, আবার মা হবার যোগ্য শরীর হচ্ছে কি না সুজাতার।

টনিক খাচ্ছ ত?

গাঢ়, যেন কফবসা গলায় জিজ্ঞেস করেন দিব্যনাথ। কামনায় অস্থির হলে ওঁর গলায় যেন কফ জমে থকথকে হয়ে যায় স্বর। সুজাতা জানেন দিন্যনাথকে। দিব্যনাথ তাঁর শরীর স্বাস্থ্যের খোঁজ নেবার একটি অর্থই হতে পারে। ডাক্তার কি করে জানবেন দিব্যনাথকে?

সুজাতাকে ওষুধ দেন। ওষুধে ব্যথা কমে নি। সেই সময়ে সহসা সুজাতার মনে ভীষণ ব্যাকুলতা এসেছিল সন্তানের জন্যে। তুলি হবার পর ছ'বছর কেটে যায় প্রায়। অনেক কষ্টে সুজাতা নিজেকে রক্ষা করেছিলেন, শেষ রাখতে পারেন নি।

তাই অশ্লীল, অশুচি লেগেছিল নিজেকে ন'মাস ধরে। শরীরের ক্রমবর্ধমান ভারকে মনে হয়েছিল অভিশাপ। কিন্তু যখন বুঝলেন তাঁর আর সন্তানের জীবনসংশয় হতে পারে, তখনি বুক ভরে উঠেছিল ব্যাকুল মমতায়। সুজাতা ডাক্তারকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বলেছিলেন, অপারেশন করুন ওকে বাঁচান।

তাই ত করছি।

ডাক্তারের কথায় নার্স ইঞ্জেকশন দেয়। যন্ত্রণা সুজাতার তলপেট ফুঁড়ে ফুঁড়ে ঢুকছিল আর বেরোচ্ছিল। উনিশশো আটচল্লিশ সাল। ষোলই জানুয়ারি। সুজাতা বিছানার সাদা চাদর খামচে ধরছিলেন বার বার। কপাল ঘেমে উঠছিল। চোখের নিচে কালো দাগটা ছড়িয়ে পড়ছিল, বড় হচ্ছিল। একটুও শীত করছিল না সুজাতার। অথচ সে জানুয়ারিতে তীব্র শীত।

তলপেটে যন্ত্রণা ফুঁড়ে ফুঁড়ে ঢুকছে আর বেরোচ্ছে। বিছানার সাদা চাদর খামচে ঘামতে ঘামতে সুজাতা জেগে উঠলেন। পাশে জ্যোতির বাবাকে দেখে তাঁর সাদা কপালে লম্বা ভুরু দুটো কুঁচকে গেল। জ্যোতির বাবা পাশের খাটে কেন? তারপর মাথা নাড়লেন! ব্রতী হবার দিন জ্যোতির বাবা কাছে ছিলেন না, তাই সুজাতার স্বপ্নেও দিব্যনাথ কখনো থাকেন না, কিন্তু এখন ত আর স্বপ্ন দেখছেন না সুজাতা।

তারপর কোনমতে হাত বাড়ালেন। ব্যারালগান ট্যাবলেট। জল। ট্যাবলেট খেলেন, জল খেলেন। আঁচল দিয়ে কপাল মুছলেন।

আবার শুলেন। এখন খুব দরকার এক থেকে একশো গুনে ফেলা। ডাক্তারের নির্দেশ। গুনলেই ব্যথা কমে যায়। গুনতে যা সময় লাগে, তার মধ্যেই ব্যারালগান কাজ করতে শুরু করে। ব্যথা কমে।

তারপর ব্যথা কমে। সুজাতাকে ক্লান্ত, অবসন্ন, পরাজিত করে ব্যথা কমে। ব্যথা এখনই কমেছে। এখন ব্যথা কমা দরকার। ঘড়ির দিকে চাইলেন। ছ'টা বেজেছে। দেওয়ালের দিকে চাইলেন। ক্যালেন্ডার। সতেরই জানুয়ারি। ষোলই জানুয়ারি সারারাত যন্ত্রণা ছিল, জ্ঞানে-অজ্ঞানে, ইথারের গন্ধ, চড়া আলো, আচ্ছন্ন যন্ত্রণার ঘোলাটে পর্দার ওপারে ডাক্তারদের নড়াচড়া সারারাত, সারারাত, তারপর ভোরবেলা, সতেরই জানুয়ারি ভোরে ব্রতী এসে পৌঁছেছিল। আজ সেই সতেরই জানুয়ারি, সেই ভোর, দু'বছর আগে সতেরই জানুয়ারি এই ঘরে, এমনি করে এই লোকটির পাশের খাটেই ঘুমোচ্ছিলেন সুজাতা। টেলিফোন বেজেছিল। পাশের টেবিলে। হঠাৎ।

টেলিফোন বাজছে। জ্যোতির ঘরে। দু'বছর আগে সেদিনের পরেই জ্যোতি টেলিফোনটা ওর নিজের ঘরে নিয়ে যায়, বিবেচক, বিবেচক জ্যোতি। তাঁর প্রথম সন্তান, তাঁর জ্যেষ্ঠ। দিব্যনাথের অনুগত বাধ্য ছেলে। বিনির সহৃদয় স্বামী, সুমনের স্নেহময় পিতা।

বিবেচক জ্যোতি। সুজাতা দু'বছর আগে একান্ন পার করেছিলেন, জ্যোতির বাবা ছাপান্ন। নিরাপদ বয়স, জীবন দু'জনের গুছানো সুশৃঙ্খল। মেয়ের বিয়ে হয়েছে, ছোট মেয়ে মন ও পাত্র স্থির করেছে, বড় ছেলে সুপ্রতিষ্ঠিত, ছোট ছেলেকে বাবা কলেজের পরই বিলাতে পাঠাবেন। সব গুছানো, সুশৃঙ্খল, সুন্দর ছিল, বড় সুন্দর।

সেই সময়ে সেই বয়সে টেলিফোন বেজেছিল। মা ঘুমচোখে রিসিভার তুলেছিলেন। হঠাৎ একটা অচেনা নৈর্ব্যক্তিক অফিসার কণ্ঠ জিজ্ঞেস করেছিল, ব্রতী চ্যাটার্জি আপনার কে হয়?

ছেলে? কাঁটাপুকুরে আসুন।

হ্যাঁ, সেই মুখ-অবয়ব-রক্তমাংসহীন কণ্ঠ বলেছিল, কাঁটাপুকুরে আসুন। রিসিভার আছড়ে পড়েছিল। মা পড়ে গিয়েছিল দাঁতে দাঁত লেগে।

দু'বছর আগে সতেরই আনুআরির ভোরে ব্রতীর জন্মদিনে ব্রতীর পৃথিবীতে পৌঁছবার সম-সমকালে এই সুন্দর ঝকঝকে বাড়িতে, এই শান্ত সুন্দর পরিবারে, এই টেলিফোনের খবরের মত একটা বিশৃঙ্খল, হিসেব ছাড়া ঘটনা ঘটেছিল।

সেই জন্যেই জ্যোতি টেলিফোনটা সরিয়ে নিয়ে যায়। সুজাতা তা জানতেন না। তিনমাস সুজাতা কিছুই জানতেন না। বিছানায় পড়ে থাকতেন চোখে হাতচাপা দিয়ে। কখনো কাঁদতেন না চেঁচিয়ে। হেম, একা হেম ওঁর কাছে থাকত, ঘুমের ওষুধ দিত, ওঁর হাত ধরে বসে থাকত।

তাই সুজাতা জানতেন না কবে টেলিফোনটা সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

তিনমাস বাদে সুজাতা আবার ব্যাংকে যেতে শুরু করলেন। আবার জ্যোতি নীপা আর তুলির সঙ্গে সহজভাবে কথা বললেন। জ্যোতির ছেলে সুমনের পেন্সিল কেটে দিলেন। জ্যোতির স্ত্রী বিনিকে বললেন, আমার কালোপাড় শাড়িটা কি কাচতে দিয়েছ?

জ্যোতির বাবা যখন বম্বে গেলেন, তখন তাঁর সুটকেসে ইসবগুলের ভুসি দিয়ে দিলেন—

এমনি করেই কখন স্বাভাবিক হয়ে গেল সব, সহজ হয়ে গেল, তখন সুজাতা লক্ষ্য করলেন টেলিফোনটা তাঁর ঘর থেকে জ্যোতির ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

দেখেই ওঁর ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল। জ্যোতির বুদ্ধি এত কম! মাথা নেড়েছিলেন বার বার জ্যোতির নির্বোধিতা দেখে। এখন ত আর কোন টেলিফোন আসবে না। জ্যোতির বাবার নিজস্ব চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্সির আপিস। জ্যোতি ব্রিটিশ নামাংকিত ফার্মে মেজসাহেব। নীপা, বড় মেয়ের বর কাস্টম্সে বড় অফিসার। তুলি যাকে বিয়ে করেছে, সেই টোনি কাপাডিয়া নিজে এজেন্সি খুলে সুইডেনে ভারতীয় সিল্ক-বাটিক, কার্পেট, পেতলের নটরাজ ও বাঁকুড়ার পোড়ামাটির ঘোড়া পাঠায়। জ্যোতির শ্বশুর-শাশুড়ি বিলাতেই থাকেন।

এরা কেউ এমন কোন বেহিসেবী, বিপজ্জনক কাজ করবে না যেজন্যে হঠাৎ টেলিফোন আসতে পারে, হঠাৎ কাঁটাপুকুর মর্গে ছুটে যেতে হবে সুজাতাকে।

এরা কেউ এমন বিরোধিতা করবে না, যেজন্যে জ্যোতি আর তার বাবাকে ছুটোছুটি করতে হয় ওপর মহলে, কাঁটাপুকুরে যেতে হয় শুধু সুজাতা আর তুলিকে।

এরা কেউ এমন অপরাধ করবে না যেজন্যে কাঁটাপুকুরে পড়ে থাকতে হয় চিত হয়ে। একটা ভারী চাদর সরিয়ে ধরে ডোম। ও. সি. জিজ্ঞেস করে, "ডু ইউ আইডেনটিফাই ইওর সান?"

এরা সবাই বিবেচক, নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলে, সৎ নাগরিক। এরা সুজাতাকে তেমন কোন অবস্থায় ফেলবে না, জ্যোতির বাবাকে বাধ্য করবে না ছুটোছুটি করতে। সত্যি বলতে কি, তাঁর ছেলে এমন কলঙ্কিতভাবে মরেছে, এই খবরটা ঢাকবার জন্যে জ্যোতির বাবা দড়ি টানাটানি করে বেড়াচ্ছিলেন।

টেলিফোনে খবরটা জানবার পরই জ্যোতির বাবার প্রথমেই মনে হয়েছিল কেমন করে খবরটা চেপে যাবেন। মনে হয় নি কাঁটাপুকুরে তাঁর যাওয়াটা বেশি জরুরি। জ্যোতি তাঁরই ভাবাদর্শে গড়া, সেও বাবার সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিল।

সুজাতাকে বাড়ির গাড়ি অবধি নিতে দেননি দিব্যনাথ। কাঁটাপুকুরে তাঁর গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকবে, সে কি হয়? যদি কেউ দেখে ফেলে?

সেদিন ব্রতীর সঙ্গে সঙ্গে সুজাতার চেতনায় ব্রতীর বাবারও মৃত্যু ঘটে। ব্রতীর বাবার সেদিনের, সেই মুহূর্তের ব্যবহার সুজাতার চেতনায় প্রবল উল্কাপাত ঘটায়। বিরাট বিস্ফোরণ। আদিম পৃথবীতে যেমন ঘটেছিল কোটি কোটি বছর আগে। যেমন বিস্ফোরণে মহাদেশগুলো ছিটকে ম্যাপের দুপাশে সরে গিয়েছিল। মাঝখানের দস্তুর ব্যবধান ঢেকে ফেলেছিল মহাসমুদ্র।

দিব্যনাথের সেদিনের ব্যবহারের ফলে, দিব্যনাথ জানেন না, সুজাতার চেতনায় তিনি মরে গেছেন, অবশেষে সরে গেলেন বহুদূরে। সুজাতার পাশেই শুয়ে থাকেন দিব্যনাথ, কিন্তু জানতে পারেন না, মৃত ব্রতীর চেয়ে জীবিত দিব্যনাথের মানসম্মানের কথা, নিরাপত্তার কথা বেশি ভেবেছিলেন সেদিন, তাই সুজাতার কাছে তিনি অনস্তিত্ব হয়ে গেছেন।

দিব্যনাথের ছোটাছুটি দড়ি টানাটানি সফল হয়েছিল। পরদিন খবরের কাগজে চারটি ছেলের হত্যার খবর বেরোয়। নাম বেরোয়। ব্রতীর নাম কোন কাগজে ছিল না।

এইভাবে ব্রতীকে মুখে দিয়েছিলেন দিব্যনাথ। কিন্তু সুজাতা তা পারেন না।

সেরকম নিয়ম-ছাড়া, রুটিন-ছাড়া ঘটনা এ বাড়িতে আর ঘটবে না। তবু জ্যোতি টেলিফোন সরিয়ে নিয়ে গেছে দেখে সুজাতা কৌতুকবোধ করেছিলেন।

বিনি ওঁর ঠোঁটে কৌতুকের হাসি দেখে মনে এত আঘাত পায় যে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে। জ্যোতিকে বলে, শি হ্যাজ নো হার্ট।

কথাটা সুজাতাকে শুনিয়ে বলা। সুজাতা শুনেছিলেন, ক্ষুণ্ন হন নি। ওঁর আগে মনে হয়েছে, আবার মনে হয়েছে, আবার মনে হয়েছিল। বিনি ব্রতীকে ভালবাসত।

তখন মনে হয়েছিল বিনি ব্রতীকে ভালবাসে। পরে সে কথা মনে হয় নি। কেননা বারান্দায় ব্রতীর ছবিটা খুঁজে পান নি সুজাতা, ব্রতীর জুতোগুলো দেখতে পান নি। ব্রতীর বর্ষাতিও ছিল না।

বিনি, ছবিটা কোথায় গেল?

তেতলার ঘরে।

তেতলার ঘরে?

বাবা বললেন...

বাবা বললেন!

ব্রতীর চলে যাবার পরও ব্রতীকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার প্রয়াস দিব্যনাথ ছাড়েন নি

দেখে সুজাতা অবাক হন নি, দুঃখও পান নি নতুন করে। শুধু অবসন্ন মনে ভেবেছিলেন, দিব্যনাথই বলতে পারেন এমন কথা। কিন্তু বিনি কি, না! বলে বাধা দিতে পারত না?

কোন কথা না বলে সুজাতা ব্যাংকে চলে যান; ব্যাংকে চাকরি তাঁর বহুদিনের। ব্রতীর তিনবছর বয়সে তিনি কাজে ঢোকেন। ব্রতীর বাবার আপিসে তখন একটু টালমাটাল যাচ্ছিল। দুটো বড় বড় অ্যাকাউন্ট বেরিয়ে গিয়েছিল হাত থেকে।

সেই সময়ে কাজে ঢোকেন সুজাতা। পরিবারের সবাই তাঁকে খুব উৎসাহ দিয়েছিল। এমনকি শাশুড়িও বলেছিলেন, করাই ত উচিত। তুমি বলেই এতদিন বাড়িতে বসেছিলে। দিবুও ত তেমন নয়। তেমন হলে তোমাকে আগেই কাজ করতে পাঠাত।

সুজাতা কেন চাকরি করতে চাইছেন, কেন নিজে খোঁজ করে যোগাযোগ করছেন, সে-কথা কেউ জানতে চাইবার যোগ্য, যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন নি। সেটা ভালই হয়েছিল। এ বাড়িতে দিব্যনাথ আর তাঁর মা সকলের মনোযোগ সবসময়ে আকর্ষণ করে রাখতেন। সুজাতার অস্তিত্বটা হয়ে গিয়েছিল ছায়ার মত। অনুগত, অনুগামী, নীরব, অস্তিত্বহীন।

চেনাশোনা লোক ছিলেন ব্যাংকে। নইলে কাজটা হত না। সুজাতা চাকরি পেয়েছিলেন পরিবার, বংশপরিচয়, অভিজাত চেহারা, বিশুদ্ধ ইংরাজি উচ্চারণের জোরে। নইলে তাঁর মত লোরেটোর বি.এ. পাস মহিলা ত কতই আছেন, তা কি সুজাতা জানতেন না?

শুধু ব্রতী কাঁদত।

স্বপ্নে, তাঁর স্বপ্নে, তিন বছরের ব্রতী তাঁর হাঁটু জড়িয়ে ধরে কতবার কেঁদে বলে, মা তুমি আজ, শুধু আজ আপিসে যেও না, আমার কাছে থাক।

ফর্সা, রোগা ব্রতী, রেশম রেশম চুল, চোখে মমতা।

সেই ব্রতী। মুক্তির দশকে একহাজার তিরাশিজনের মৃত্যুর পরে চুরাশি নম্বরে ওর নাম। কেউ যদি মুক্তির দশকের আড়াই বছরে নিহত ছেলেদের নাম সংগ্রহ করে থাকে, তবে সে কি ব্রতীর নাম খুঁজে পাবে? কাগজ দেখে যদি খোঁজ করে থাকে, সে ত জানবে না ব্রতীকে।

ব্রতীর বাবা ওর নাম কাগজে উঠতে দেন নি।

ব্রতী চ্যাটার্জি?

আপনি কে হন?

না, মুখ দেখতে হবে না।

আইডেন্টিফিকেশন মার্ক?

গলায় জড়ুল?

মুখ দেখতে হবে না?

কি বলেছিলেন তিনি? আমি দেখব? নীল শার্ট দেখে, আঙুল দেখে, চুল দেখে, কোথায় তবু সংশয় ছিল মনে। কোথায় যুক্তি বুদ্ধি চোখের দেখা সব পরাস্ত করে সংশয় বলছিল, না মুখ দেখলে জানা যাবে এ ব্রতী নয়? তাই কি সুজাতা বলেছিলেন...

ডোমটি ওঁর ওপর অসীম করুণায় বলেছিল, কি আর দেখবেন মাইজী? মুখ কি আর আছে কিছু?

তখন কি করেছিলেন সুজাতা? অন্য চারটি শব পড়ে আছে। কারা যেন আকুল হয়ে কাঁদছে। কে যেন মাথা ঠুকছে মাটিতে। কারো মুখ মনে পড়ে না। সব ধোঁয়া ধোঁয়া। কিন্তু কোন কোন স্মৃতি হীরের ছুরির মত উজ্জ্বল, কঠিন, স্বয়ংপ্রভ।

ওর বুকে, পেটে আর গলায় তিনটে গুলির দাগ ছিল। নীল গর্ত। শরীরে খুব কাছ থেকে ছোড়া গুলি। নীলচে চামড়া। কর্ডাইটের ঝলসানিতে পোড়া বাদামি রক্ত। গর্তের চারদিকে কর্ডাইটের ঝলসানিতে ঝলসানো হেলো, চক্রকার ফাটাফাটা চামড়া। গলায়, পেটে আর বুকে তিনটে গুলির দাগ।

ব্রতীর মুখ, ব্রতীর মুখ, সুজাতা সবলে দুহাতে চাদর সরিয়ে দেন, ব্রতীর মুখ। শাণিত ও ভারী অস্ত্রের উলটো পিঠ দিয়ে ঘা মেরে থেঁতলানো, পিষ্ট, ব্রতীর মুখ। পেছন থেকে তুলির অস্ফুট আর্তনাদ।

সেই মুখই দেখেন সুজাতা ঝুঁকে পড়ে। আঙুল বোলালেন। ব্রতী! ব্রতী! বলে আঙুল বোলালেন, আঙুল বোলাবার মত মসৃণ চামড়া ছিল না এক ইঞ্চিও। সবই দলিত, থেঁতলানো মাংস। তারপর সুজাতাই মুখ ঢেকে দেন। পেছন ফেরেন। অন্ধের মত তুলিকে জাপটে ধরেন।

ব্রতীর বাবা ছবিটা সরিয়ে দিতে বলেছেন, একথা ব্যাংকে যাবার সময়ও মনে ছিল। প্রথম দিন ব্যাংকে যাবার সময়ে।

ব্যাংকে সবাই ওঁর দিকে তাকাচ্ছিল। হঠাৎ সকলের কথা আস্তে হয়ে গিয়েছিল, তারপর চুপচাপ।

এজেন্ট লুথরা এগিয়ে এসেছিল।

ম্যাডাম, সো সরি...

থ্যাংক য়ু। সুজাতা মুখ তোলেন নি।

মেমসাব!

একটা জলের গেলাস। ভিখন এগিয়ে ধরেছিল। সুজাতার পুরনো অভ্যেস, আপিসে এসে জল খান এক গেলাস।

মেমসাব!

ভিখন আস্তে বলেছিল। সুজাতা ওর চোখে বেদনা দেখেছিলেন, মমতা। ভিখন চোখ দিয়ে ওঁকে জড়িয়ে ধরেছে। উনি ওকে জড়িয়ে ধরেছিলেন একদিন। যেদিন ব্যাংকে তার এসেছিল ভিখনের ছেলে অসুখে মরে গেছে।

ভিখনের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছিলেন সুজাতা। এখনি উনি ওর সহানুভূতি নিতে পারছেন না। ভিখন, আমায় ক্ষমা কর। ব্রতীর মৃত্যু তোর ছেলের মৃত্যুর মত নয় যে? তোর ছেলের মৃত্যু এমন মৃত্যু, তাতে তোকে দেখলেই তুই যে বেয়ারা তা ভুলে গিয়ে তোকে জড়িয়ে ধরা যায়।

ব্রতী তো তেমন করে মরে নি। ব্রতীর মৃত্যুর আগে অনেক প্রশ্ন, পরে অনেক প্রশ্ন। প্রশ্নচিহ্ন। সরাসরি প্রশ্নচিহ্নের মিছিল। তারপর সব প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকতেই, একটি প্রশ্নেরও উত্তর না মিলতেই হঠাৎ ব্রতী চ্যাটার্জির ফাইল বন্ধ করে দেওয়া।

তুই আমাকে মাপ কর ভিখন।

সারাদিন যন্ত্রচালিতের মত কাজ করছিলেন। সন্ধ্যায় ব্রতীর বাবা বাড়ি ফিরতেই জিজ্ঞেস করেছিলেন,

তুমি ব্রতীর ছবি তেতলায় সরিয়ে দিতে বলেছ?

হ্যাঁ।

ব্রতীর জুতো?

হ্যাঁ।

কেন?

কেন!

দিব্যনাথকে নেড়েছিলেন। কেন ব্রতীর জিনিসপত্র সরিয়ে দেওয়া দরকার, কেন ব্রতীর অস্তিত্ব, স্মৃতিচিহ্ন মুছে ফেলা দরকার তা যদি সুজাতা না বোঝেন, কে তাঁকে বোঝাবে?

দিব্যনাথ কথা বলেন নি।

তেতলার ঘর কি চাবি বন্ধ?

হ্যাঁ।

চাবি কার কাছে?

আমার কাছে।

দাও।

চাবিটা হাতে নিয়ে উঠে গিয়েছিলেন সুজাতা। তেতলার ঘরে ব্রতী ঘুমতো। আট বছর থেকে ওই ব্যবস্থা। প্রথমটা একা শুতে চাইত না। একলা শুতে ওর ভয় করত। সুজাতা বলেছিলেন, ঠিক আছে, হেম মেঝেতে শোবে।

দিব্যনাথ রেগে যান। জ্যোতির বেলা সুজাতার এই দুর্বলতা ছিল না, নীপা আর তুলির বেলাতেও নয়, এইসব কথা বলেন। সুজাতা বলেছিলেন, ওদের বেলাতে ওঁর আপত্তি ছিল। কেননা ওরাও ভয় পেত, কিন্তু তখন দিব্যনাথ যা বলেছেন তার অন্যথা হতে পারে এ সুজাতা জানতেন না।

ভয় পেত ব্রতী, খুব ভয় পেত। অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ শিশু যেমন ভয় পায়। রাতে হরিধ্বনি শুনে ভয় পেত, দিনে বহুরূপী ডাকাত সেজে এসে চেঁচালে ভয় পেত। তারপর একদিন ওর সব ভয় চলে যায়।

এখন তো ব্রতী সব ভয় আর অভয়ের বাইরে।

ছোটবেলা থেকে মৃত্যুর কবিতা বড় প্রিয় ব্রতীর। তাইত সুজাতার স্বপ্নে সাতবছরের ব্রতী পা ঝুলিয়ে জানলায় বসে বসে কবিতা পড়ে কত। স্বপ্নে সুজাতা যখন ব্রতীকে দেখেন, তখন তাঁর মনে দু'রকম চেতনা কাজ করতে থাকে। একটা মন বলে এ'ত স্বপ্ন। ব্রতী নেই। এ শুধু স্বপ্ন।

আরেকটা মন বলে স্বপ্ন নয় সত্যি।

সুজাতার স্বপ্নে তাই ব্রতী জানলায় বসে পা ঝুলিয়ে কবিতা পড়ে। সুজাতা বিছানায় বসে শোনেন, ব্রতীর বিছানায়। শোনেন আর ব্রতীর চাদর টেনে দেন। বালিশ ঠিক করে দেন।

কখনো ব্রতী ঘুমিয়ে পড়ে,

"ভয়কাতুরে ছিল সে সবচেয়ে।
সেই খুলেছে আঁধার ঘরের চাবি।"

কখনো বা স্বপ্নে দেখেন ব্রতী 'শিশু' বইটা নিয়ে ঘুরে ঘুরে পড়ছে।

'আধার রাতে চলে গেলি তুই।
আঁধার রাতে চুপি চুপি আয়
কেউতো তোরে দেখতে পাবে না
তারা শুধু তারার পানে চায়।'

ঘুমের মধ্যে 'ব্রতী!' বলে ডুকরে ডেকে ওঠেন সুজাতা। তারপর ঘুম ভেঙে যায়। এত সত্যি যে স্বপ্নে, এত সত্যি যে, চমকে চমকে চেয়ে সুজাতা দেখেন ব্রতী কোথায়!

তেতলার ঘরের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন সুজাতা। ব্রতীর বিছানা গোটানো। জামা আলমারিতে তোলা। দেওয়ালে ছবি। শেল্‌ফে বই। শধু স্যুটকেসটা নেই। ওটা পুলিশ নিয়ে গিয়েছিল।

ব্রতীর খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে সুজাতা ভুরু কুঁচকে ভাবতে চেষ্টা করছিলেন, ব্রতীর হত্যার পেছনে তাঁর কি পরোক্ষ অবদান ছিল? কিভাবে তিনি তৈরি করেছিলেন ব্রতীকে যে জন্যে এই দশকে যে দশক মুক্তির দশকে পরিণত হতে চলেছে সেই দশকে, ব্রতী হাজার চুরাশি হয়ে গেল! অথবা কি করতেন তিনি, অথচ করেন নি বলে ব্রতী হাজার চুরাশি হয়ে গেল? কোথায় সুজাতা ব্যর্থ হয়েছিলেন?

দিব্যনাথ ব্রতীকে সহ্য করতে পারতেন না। বলতেন,

মাদার্স চাইল্‌ড! তুমি ওকেই শিখিয়েছ আমার শত্রু হতে।

সুজাতা অবাক হয়ে যেতেন। কেন তিনি ব্রতীকে বলতে যাবেন তোর বাবার শত্রু হ'? কেন বলবেন? দিব্যনাথ কি সুজাতার শত্রু? দিব্যনাথ যাতে যাতে বিশ্বাস করেন, সেই সম্ভ্রান্ততায়, সচ্ছলতায়, নিরাপত্তায় ত সুজাতাও বিশ্বাস করেন। বিশ্বাস করেন কি না সুজাতা কখনো সে প্রশ্ন নিজেকে করেন নি। করেন নি যখন, তখন নিশ্চয় তাঁর কোন প্রশ্নই ছিল না।

সুজাতা বড়ঘরের মেয়ে। অত্যন্ত রক্ষণশীল পরিবার তাঁদের। লোরেটোয় পড়ানো বি. এ. পাস করানো সবই বিয়ের জন্যে। ছেলের অবস্থা খারাপ, জেনেশুনেই তাঁকে বড়ঘরের ছেলে দিব্যনাথের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। সুজাতার বাবা জানতেন দিব্যনাথ অনেক ওপরে যাবেন।

এই বাড়ি সচ্ছলতা, নিরাপত্তা, এতে সুজাতাও বিশ্বাস করেন। অতএব দিব্যনাথের অভিযোগ মিথ্যে।

যদি দিব্যনাথের অভিযোগ মিথ্যে হয়, তাহলে শুধু এই প্রমাণ হয় যে, সুজাতা ব্রতীকে দিব্যনাথের শত্রু হতে বলেন নি। এ প্রমাণ হয় না যে ব্রতী ওর বাবাকে শত্রু ভাবে। ব্রতী যে দিব্যনাথকে সহ্য করতে পারে না সে ত সুজাতাও জানেন। ভাল করেই জানেন।

কেন, ব্রতী?

দিব্যনাথ চ্যাটার্জি একক ব্যক্তি হিসেবে আমার শত্রু নন।

তবে?

উনি যেসব বস্তু ও মূল্যে বিশ্বাস করেন, সেগুলোতেও অন্য বহুজনও বিশ্বাস করে। এই মূল্যবোধ যারা লালন করছে, সেই শ্রেণিটাই আমার শত্রু। উনি সেই শ্রেণিরই একজন।

কি বলিস তুই ব্রতী? বুঝি না।

বুঝতে চেষ্টা করছ কেন? বোতামটা লাগাও না।

ব্রতী, তুই খুব অন্যরকম হয়ে যাচ্ছিস।

কি রকম?

বদলে যাচ্ছিস।

বলদাব না?

কোথায় ঘুরিস সারাদিন?

আড্ডা দিই।

কাদের সঙ্গে?

বন্ধুদের।

নে তোর জামা। বোতাম লাগাতে বললি তাই মার সঙ্গে দুটো কথা বলার সময় হল।